OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 538 - 546
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঠাকুরবাড়ির নারীকণ্ঠে সুরের আলাপন

সঞ্চিতা দত্ত
গবেষক, পারফর্মিং আর্টস বিভাগ (সংগীত)
সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, নিউটাউন, কলকাতা
Email ID: sanchitadutta6666@gmail.com
0009-0009-4039-1783

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Bengal Renaissance, Jorasanko Thakurbari, Andarmahal, Women's Musical Agency, Patriarchal Resistance, Swarnakumari Devi, Sarala Devi Chaudhurani, Indira Devi Chaudhurani, Rabindra Sangeet, Cultural.

Abstract
This study explores the historical and cultural contributions of the women of the Jorasanko Tagore family (Thakurbari) during the 19th-century Bengal Renaissance, focusing specifically on their musical and creative endeavors. While mainstream historical discourse has long centered on the male luminaries of the family, the artistic agency of the women within the inner courtyard (andarmahal) remained largely marginalized. Drawing upon the theoretical frameworks of Friedrich Engels, Kate Millett, and Simone de Beauvoir, this paper examines how patriarchal structures historically restricted female creativity, relegated women to domestic servitude, and socially stigmatized their musical practices by associating public performance with courtesan culture—a historical phenomenon analyzed by Sukumari Bhattacharji. Against this restrictive social landscape, where female literacy was actively discouraged by superstitions, the Jorasanko Tagore family emerged as a progressive anomaly. Initiated by Maharshi Debendranath Tagore, who introduced formal musical training and instruments into the household, a structured, intellectually stimulating environment was established. This enabled the women of the house to transcend the role of mere hobbyists and emerge as active cultural creators, lyricists, and music theorists.

Through a detailed analysis, this paper reconstructs the comprehensive narrative of the musical sadhana of the Thakurbari women, highlighting the groundbreaking contributions of three pivotal figures: Swarnakumari Devi, Sarala Devi Chaudhurani, and Indira Devi Chaudhurani. Swarnakumari Devi (1855–1932) was a trailblazing editor and litterateur who pioneered Bengali musical opera with Basanta Utsav and published meticulously annotated musical notations, challenging patriarchal exclusivity in the arts. Her daughter, Sarala Devi Chaudhurani (1872–1945), a multi-instrumentalist and composer, collected provincial folk and Carnatic melodies that directly inspired iconic Rabindra Sangeet compositions. She also completed the musical score for Bankim Chandra Chatterjee's Vande Mataram, composed numerous nationalistic songs, and published the compilation Gititrishati. Finally, Indira Devi Chaudhurani remains a seminal figure celebrated for her contributions to music theory, notation preparation,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

and the systemic preservation of Rabindra Sangeet. Ultimately, this paper demonstrates that the creative expressions of these women were not accidental historical footnotes, but deliberate, historic acts of self-actualization, agency, and resistance against patriarchal confinement.

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এক অনন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য, সংগীত, নাট্যচর্চা, চিত্রকলা, দর্শন ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এই পরিবারের অবদান সুদূরপ্রসারী। তবে ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিসরের আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরে পুরুষ সদস্যদের অবদানই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে; অন্তঃপুরে অবস্থান করেও যাঁরা বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেছিলেন, সেই নারীদের সৃজনশীল অবদান তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে ইতিহাসের এক নির্মম সত্যকে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছিল নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। এই পরিবর্তনের পর পুরুষ ঘরের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয়, নারীকে করে তোলে পদাণত, নিজের লালসার দাসী এবং সন্তান উৎপাদনের একটি যন্ত্র মাত্র। এই মন্তব্যের আলোকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কীভাবে এক-পতিপত্নী পরিবারের জন্মলগ্ন থেকেই নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে দাসত্বের শর্ত ও আনুগত্যের কঠোর শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা হয়েছে. 'Famulus' বা 'Familia' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এর মূলে রয়েছে গৃহদাস বা দাস-মালিকের সম্পর্ক। ফলে পরিবারকে ঘিরে যে আধুনিক মধুর সম্পর্ক বা সংস্কৃতির মিথ তৈরি হয়েছে, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। তত্ত্বগতভাবে নারীর এই সামাজিক অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্র ও পরিবার সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে নারীর এই অপসারণের ফলে সমস্ত সৃজনশীল প্রকল্প পুরুষের করায়ত্ত হয় এবং সংস্কৃতির নির্মাণ পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে থাকে। ঘরের অন্দরে অবরুদ্ধ নারীর ওপর সেবাপরায়ণতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং কোমলতার মতো গুণাবলী জোরপূর্বক আরোপ করা হয়। বিপরীতে, সক্রিয়তা ও সৃষ্টিশীলতাকে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেট মিলেট তাঁর 'Sexual Politics' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে পিতৃতন্ত্র তার আগ্রাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায় এবং পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের সামাজিকীকরণের ফলেই এই অসম বিভাজনকে সমাজ স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। একই সুর ধ্বনিত হয় সিমন দ্য বোভোয়ারের 'The Second Sex' গ্রন্থেও, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে পুরুষ নিজেকে প্রধান বা 'Essential' এবং নারীকে অপ্রধান বা 'Inessential' হিসেবে প্রতিপন্ন করে। নারী সেখানে নিজেকে কোনো এক নতুন প্রভুর চরণে নিজেকে নিষ্ক্রিয় ও অনুগতভাবে সমর্পণ করার মধ্য দিয়েই তার ভবিষ্যৎ খোঁজে। সমর্পণের এই মনস্তত্ত্ব নারীর আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়।

ইতিহাসের অরণ্যগর্ভে নারীর নৃত্য-গীত-মনন চর্চাকে সমাজ দীর্ঘকাল ধরে অবদমিত করে এসেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীনভারত সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে গণিকা শব্দের নানাবিধ প্রতিশব্দ এবং প্রাচীন সমাজে তাদের অবস্থানের এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। অথর্ববেদ, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা, গালি বিনয়পিটক, অর্থশাস্ত্র এবং জাতক— সর্বত্রই গণিকাবাচক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন রাষ্ট্রে গণিকাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান ছিল অত্যন্ত উন্নত। গীত, বাদ্য, অভিনয় ও কাব্য রচনার মতো উচ্চমানের শিল্পকলা গণিকাদের শিক্ষাতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাষ্ট্র স্বয়ং তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করত এবং বিনিময়ে তাদের আয় থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করত। এমনকি কৌটিল্য বার্ধক্যে গণিকাদের বৃত্তিদানের কথাও বলেছেন। কিন্তু এই বৃত্তির অন্ধকার দিকটি সুকুমারী ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কুলনারীদের দিন কাটত স্বামী, পুত্র ও শ্বশুরকুলের সেবায়, যেখানে তাদের মননচর্চার কোনো স্থান ছিল না। পক্ষান্তরে, পরিমার্জিত রুচি, শিক্ষা ও মানসিক সাহচর্যের জন্য পুরুষেরা গণিকাদের দ্বারস্থ হত, বধূদের কাছে নয়। ফলস্বরূপ, নারীর শিল্প ও সংগীত চর্চাকে সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহব্যবসার সাথে যুক্ত করে ফেলেছিল। একপক্ষের অবাধ যৌন আচরণের মধ্য দিয়ে নারীকে 'যৌনবস্তু' হিসেবে দেখার এক ক্ষতিকর সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এঙ্গেলসও এই প্রাঙ্গণে মন্তব্য করেছেন যে, 'হেটেরিজম' বা এই ধরনের যৌনাচার আসলে গোষ্ঠীবিবাহ ও নারীদের অর্থ বা ধর্মের নামে নিজেদের পবিত্রতা বিসর্জনের এক ধারাবাহিক রূপ, যা পরিবার প্রথাকে এক কালোছায়ার মতো আজও অনুসরণ করে চলেছে।

উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রসমাজ এবং অন্তঃপুরের চিত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীদের বিদ্যাভ্যাসকে সমাজ সহজভাবে গ্রহণ করত না। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর 'আমার জীবন' আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন কীভাবে তৎকালীন সমাজে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। পরমেশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন পরজন্মে অন্তত পুথি পড়ার সুযোগ পান। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' গ্রন্থে তৎকালীন পণ্ডিতদের মনোভাব তুলে ধরে লিখেছেন যে, পণ্ডিতেরা বলতেন— মেয়েরা লেখাপড়া করলে বা কালীর অণুপাত করলে লক্ষ্মী ত্যাগ হয় এবং মেয়েদের শাস্ত্রে অধিকার নেই। এই ধরনের নানাবিধ অসংগত বাক্যের দ্বারা নারীদের প্রতিনিয়ত বঞ্চনা করা হত। তবে এই কঠোর ও বৈরী পরিবেশের মধ্যেও একটি বিশেষ ব্যতিক্রমী ধারা লক্ষ্য করা যায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে প্রথম হারমোনিয়াম আনিয়ে মেয়েদের সংগীত চর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে প্রথাগত বিদ্যাচর্চা ও সংগীত শিক্ষা কেবল একটি শৌখিন বিষয় ছিল না, ছিল এক নিয়মিত নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠান। সেখানে গয়লা, পুরোহিত বা গৃহশিক্ষকেরা নিয়মিত আসতেন এবং উচ্চ ভাবাদর্শ ও সংবেদনশীলতার এক বিরল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই উদ্যোগের পেছনে লক্ষ্য ছিল নারীজগৎকে এক নতুন রূপ দেওয়া এবং মেয়েদের রুচি ও যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলা। সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মতো ব্যক্তিত্বরা নারীসত্তার সৃজনশীল বিকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশেষত ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সংগীতভাবনা, স্বরলিপি নির্মাণ, রবীন্দ্রসংগীত সংরক্ষণ এবং সংগীততাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সংগীত-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন। এই প্রবন্ধে ঠাকুরবাড়ির নারীসমাজের সংগীতচর্চার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সংগীতভাবনা ও সৃষ্টিশীল অবদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তঃপুরের সংগীতসাধনার একটি সামগ্রিক চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ঠাকুর পরিবারের সংগীতচর্চার ইতিহাস বহু প্রজন্ম বিস্তৃত। পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনা এবং সামাজিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে এই পরিবারের মধ্যে সংগীতের যে ধারা গড়ে উঠেছিল, তা ক্রমশ একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়। পরিবারের প্রাচীন সদস্যদের মধ্যে রামলোচন ঠাকুর সংগীতানুরাগী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে কবিয়াল, কীর্তনশিল্পী ও বিভিন্ন ঘরানার গায়কদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গৃহমধ্যে গানের আসর বসানোর রীতি প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়ে এই সংগীতচর্চা আরও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। তিনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কেও আগ্রহী ছিলেন। তাঁর বেলগাছিয়ার বাসভবনে দেশি-বিদেশি অতিথিদের সম্মানে নৃত্য-গীতের আসর অনুষ্ঠিত হত। বিদেশযাত্রার সময় তিনি একজন ইউরোপীয় সংগীতজ্ঞকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে পারিবারিক সংগীতচর্চা নতুন মাত্রা লাভ করে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর ধর্মীয় উপাসনায় ব্রাহ্মসংগীতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় অনুশীলনের পাশাপাশি সংগীতকে আত্মশুদ্ধি ও নান্দনিক চেতনার বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাড়িতে নিয়মিত ওস্তাদ রেখে গান শেখানো, দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ এবং সংগীতজ্ঞদের আনাগোনার ফলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ক্রমে এক সজীব সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এর বহুমাত্রিকতা। এখানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, ব্রাহ্মসংগীত, বাউলগান এবং পাশ্চাত্য সংগীত— সমস্ত ধারার প্রতি সমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সংগীতকে কেবল বিনোদনের বিষয় হিসেবে নয়, বরং মননশীলতা ও রুচিবোধের বিকাশের অন্যতম উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সংগীতমুখর পরিবেশেই পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা ধীরে ধীরে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তাঁদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম, যিনি সাহিত্য ও সংগীত- উভয় ক্ষেত্রেই এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার ভদ্রসমাজে নারীর জীবন ছিল মূলত গৃহকেন্দ্রিক। শিক্ষালাভ, সাহিত্যচর্চা কিংবা সংগীতসাধনার ক্ষেত্রেও নারীদের স্বাধীন অংশগ্রহণকে সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সংগীতচর্চাকে অনেকাংশে পেশাদার গায়িকা বা নর্তকীদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার প্রবণতা ভদ্রঘরের নারীদের সংগীতচর্চাকে আরও সংকুচিত করে তুলেছিল। এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি নারীর শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা নয়, সংগীত, সাহিত্য এবং চারুকলার মধ্য দিয়েও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই উপলব্ধির ফলেই ঠাকুরবাড়ির কন্যাদের জন্য নিয়মিত সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পাশাপাশি গানের ওস্তাদ নিয়োগ, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের আবদ্ধ পরিসরকে এক সাংস্কৃতিক শিক্ষাঙ্গনে রূপান্তরিত করে।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবী পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও সাহিত্য ও ব্রাহ্মসংগীত রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত ব্রাহ্মসংগীত পারিবারিক উপাসনায় ব্যবহৃত হত। যদিও তিনি প্রকাশ্যে সংগীত পরিবেশন করতেন কি না তার নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, তথাপি পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আবির্ভাব ঠাকুরবাড়ির নারীজীবনে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ, পোশাক-পরিচ্ছদে নবীনতার প্রবর্তন, সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের উৎসাহ এবং সন্তানদের মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় করে তোলার প্রচেষ্টা ঠাকুরবাড়ির নারীসমাজকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে সংগীতচর্চা কখনও নিছক বিনোদনের বিষয় ছিল না। এটি ছিল নন্দনতত্ত্ব, আত্মিক চর্চা এবং সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম। মাঘোৎসব, ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান, পারিবারিক সভা কিংবা ঘরোয়া গানের আসরে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এর ফলে সংগীতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেবলমাত্র শ্রোতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাঁরা ধীরে ধীরে গীতিকার, সুরকার, বাদক এবং সংগীততাত্ত্বিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

মীনা চট্টোপাধ্যায়ের ‘মেধাবী অন্বেষণ’ এবং চিত্রা দেবের বিভিন্ন লেখার তথ্যসূত্র অনুযায়ী, এক অবরুদ্ধ ও প্রতিকূল সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫–১৯৩২) হয়ে উঠেছিলেন এক অনন্য ব্যতিক্রমী ও জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব. অতি শৈশবে ছড়া বেঁধে কবিতার ছন্দে কথা বলা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল সহজাত। কারুর বাঁশি বাজানো শুনলেই তিনি তন্ময় হয়ে পড়তেন এবং তাঁর হৃদয়ে কল্পনার বিচিত্র ছবি ফুটে উঠত। একদিন তিনি যখন নিজের মনে গান গাইছিলেন, তখন তাঁর নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তা শুনে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, -

“স্বর্ণ, তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তা ত জানতাম না!”[১]

এই সঙ্গীতানুরাগই পরবর্তীকালে তাঁকে বহু গান ও কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলায় প্রায় ছাব্বিশ জন সম্পাদিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, যার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদিকা ও প্রকৃত কর্ণধার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই সম্পাদনা, সখি-সমিতি স্থাপন করে নারীকল্যাণমূলক কাজ করা এবং বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম ‘শিল্পমেলা’ সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে এক ভিন্ন ও স্বাধীন নারীর রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে তিনি বাংলা পরিভাষার অভাব বোধ করেন এবং নিজেই বেশ কিছু নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যিক প্রতিভা কেবল প্রবন্ধ বা সম্পাদনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি নামহীনভাবে ‘দীপনির্বাণ’ উপন্যাস রচনা করেন, যার সাবলীল লিখনশৈলী পাঠকদের চমকে দিয়েছিল. তৎকালীন ‘সাধারণী’ কাগজ এই উপন্যাসের প্রশংসা করলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে এটি কোনো অভিজাত পরিবারের মেয়ের লেখা কি না। উপন্যাস ছাড়াও তিনি গল্প, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গাথা, গান, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, গীতিনাট্য এবং স্কুলপাঠ্য বই লিখে এক বিশাল সৃজনশীল জগৎ গড়ে তুলেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলায় গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ. রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'র আগেই স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যটি রচিত ও ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া আসরে অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে কাদম্বরী দেবী নায়িকা সেজেছিলেন এবং স্বর্ণকুমারী দেবী স্বয়ং সন্ন্যাসিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর এই সামগ্রিক সাধনা ছিল পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির দাপুটে প্রেক্ষাপটে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ. ১৯২৩ সালে তাঁর গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, যেখানে রাগ-রাগিণী ও তালের সুচারু নির্দেশ থাকত। বাউল, কীর্তন এবং সরস কৌতুক গানে তিনি যে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা তৎকালীন 'বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৭৫) শ্রী পশুপতি শাসমল বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতিনাট্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পরবর্তীকালে সরলাদেবী চৌধুরানী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখেছেন যে, এটি কোনো ইউরোপ ভ্রমণপুষ্ট বহুদূরের অভিজ্ঞতা নয়, বরং নিছক ঘরের ভেতরে অন্তঃপুরে বসে রচিত এক অপূর্ব সৃষ্টি। বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে শিল্পমেলার আয়োজন, নারীকল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞানচর্চার জন্য বাংলা পরিভাষা নির্মাণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর সংগীতসাধনা নিছক শিল্পচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; ছিল নারীসত্তার আত্মপ্রকাশের এক সাহসী পদক্ষেপ। পুরুষপ্রধান সমাজে শিল্পসৃষ্টির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রয়াস তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের নারীশিল্পীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।

তৎকালীন লিঙ্গ রাজনীতির আগ্রাসন ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জোড়াসাঁকোর এই অন্তঃপুরিকা যেভাবে নিজের মৌলিক স্বর উচ্চারণ করেছিলেন, তা এক নতুন জাগরণের সূচনা করে। মেরি ওলস্টোনক্রাফটের সেই ঐতিহাসিক সতর্কবার্তা— সৃষ্টির অর্ধেক মানবজাতি যদি স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার না পায়, তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের স্বাধীনতাও হারাবে। স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবন ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন এক মূর্ত রূপ লাভ করেছিল. তাঁর এই সাধনা প্রমাণ করে যে, নারীর মৌলিক কণ্ঠস্বর ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্বাবলম্বন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তা হল পুরুষতান্ত্রিক দাসত্বের অন্ধকার ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত বাতাসে ডানা মেলার এক সঙ্কল্পবদ্ধ ঐতিহাসিক যাত্রা।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সরলা দেবী চৌধুরানীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল এবং মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। ঠাকুরবাড়ির সংগীতমুখর পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছিলেন। একদিকে পিতৃকুল থেকে সাহস ও আত্মশক্তি এবং অন্যদিকে মাতামহকুল থেকে ললিতকলা বিষয়ক বিবিধ জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র সাড়ে সাত বছর বয়সে তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর প্রথম সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল 'অঞ্জুবাবু'-র কাছে, যিনি বিষ্ণুবাবুর পর ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বাড়িতে দেশি ও বিদেশি সংগীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা সমান তালে চলত।

সরলা দেবী বাল্যকাল থেকেই সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। কেবল কণ্ঠসংগীতই নয়— পিয়ানো, বেহালা, বীণা ইত্যাদি একাধিক যন্ত্র বাজাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। মাত্র ৯-১০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা' গানটি তাঁর শিশুমনকে আলোড়িত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেশি সংগীত চর্চার পাশাপাশি বিলাতি সংগীত চর্চাতেও উৎসাহ দিতেন। সরলা দেবী খুব সহজভাবেই বাংলা গানে ইংরেজি সুরের কর্ড বসিয়ে গানটিকে ইংরেজি 'piece'-এ পরিণত করতে পারতেন। একবার রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি পিয়ানো যন্ত্রে সুরে ও তালে বিধিবদ্ধ করেছিলেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের বারো বছরের জন্মদিনের দিন কাশিয়াবাগানের বাড়িতে গিয়ে তিনি একটি ইউরোপীয় 'music' লিখেছিলেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউজিক থেকে প্রেরিত সংগীতের উপপত্তিক বিষয়ের পরীক্ষায় ঠাকুরবাড়ির অন্য কন্যাদের সাথে সরলা দেবীও কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

ঠাকুরবাড়ির ১১ই মাঘের মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে সাধারণত বাড়ির বড়রাই সংগীত পরিবেশন করতেন। তবে সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখরা বড়দের পরিচালনায় ১৫ দিন আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে সেই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতেন। সরলা দেবী বেহালা ও পিয়ানো বাজানোতে সুদক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে পিয়ানো ও বেহালার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহায্যে তিনি উৎসবের শুরুতে মিলিত যন্ত্র সহযোগে নির্দিষ্ট রাগ বা রাগিণীর আলাপ ও ইংরেজি ধাঁচের কনসার্ট আয়োজন করতেন।

সরলা দেবী যখনই কর্মসূত্রে বা ভ্রমণের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাড়ি দিয়েছেন, সেখান থেকে সেখানকার স্থানীয় সংগীতগুলি সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত এই সকল সুরগুলি তিনি তাঁর প্রিয় 'রবিমামা'-কে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপহার দিতেন। চুঁচুড়ায় থাকার সময়ে তিনি সেখানকার মাঝিদের কাছ থেকে বেশকিছু বাউল গান শিখেছিলেন। সংগৃহীত এই সমস্ত গানই তিনি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিতেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই গানগুলির সুর নিয়ে সামান্য অদলবদল করে নতুন শব্দ চয়নে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রবীন্দ্রসংগীত রচনা করতেন। যেমন— সরলা দেবীর সংগৃহীত 'মনমাঝি সামাল সামাল' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'এবার তোর মরা গাঙে', কিংবা 'ও মন অসার মায়ায়' থেকে 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক' গানটির সৃষ্টি হয়। সংগীতের মাধ্যমেই মূলত তাঁদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগের এক অপূর্ব সেতু গড়ে উঠেছিল।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত সরলা দেবীর 'আহিতাগ্নিকা' কবিতা এবং ঋগ্বেদের কবিতা অবলম্বনে 'শুন! শেফের বিলাপ' পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। মহর্ষির প্রিয় কবি ছিলেন পারসী কবি 'হাফিজ'। তিনি হাফিজের কবিতার কটি লাইনে সুরারোপ করার ভার সরলা দেবীর ওপর দেন। সরলা দেবী এক সপ্তাহের মধ্যে কবিতাটিতে সুরারোপ করলে, মহর্ষির নির্দেশে দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় বাড়ির বড়দের সম্মুখে হাফিজের কবিতাটি বেহালা বাজিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুরে গেয়ে শোনান সরলা দেবী। এই অপূর্ব সুর শুনে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি তাকে আশীর্বাদস্বরূপ বিখ্যাত স্বর্ণকারের তৈরি এক হাজার টাকা মূল্যের হীরে ও চুনি বসানো সোনার নেকলেস ও ব্রেসলেটের সেট উপহার দেন এবং বলেন—

"তুমি সরস্বতী। তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।"[২]

সরলা দেবী বেথুন স্কুল থেকে বি.এ পাস করার পর বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রীদের নাচ-গান শেখানোর দায়িত্ব পান। এই সূত্রে তিনি ছাত্রীদের জন্য 'নমো নমো ভারত জন।' গানটি রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথম দুটি পদে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করলেও, বাকি অংশটুকু সুরারোপ করার ভার তিনি সরলা দেবীর ওপর দেন। সরলা দেবী 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো গানটির সুরারোপ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের অনুরোধে সরলা দেবী 'বন্দে মাতরম্' গানটি গেয়ে শোনান। সেখানে তিনি 'সপ্তকোটি'-র স্থলে 'ত্রিশকোটি' শব্দটি ব্যবহার করে সমগ্র দেশবাসীকে একসূত্রে বাঁধেন। এছাড়া ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত 'হিন্দুস্থান' গানটি ৩০০ জন ভলেন্টিয়ার দ্বারা সমবেত কণ্ঠে গীত হয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মতিলাল নেহরুর অনুরোধে জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্র অবলম্বনে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' সূক্তটিতে সুর সংযোজনা করেছিলেন। সমগ্র জীবনে তিনি অনধিক চল্লিশটির মতো দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন।

সরলা দেবী দু'বার মহীশূরে গিয়েছিলেন। প্রথমবার সেখানে গিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সংগীত ও তালের নিজস্ব আবেদনে মুগ্ধ হন। সেখানে রাজ-অতিথি হিসেবে আপ্যায়িত হয়ে তিনি এক দেওয়ানের পৌত্রীর কণ্ঠে বিখ্যাত তেলুগু কবি 'ত্যাগরাজে'-র রচিত দাক্ষিণাত্যের ধ্রুপদী সংগীত শুনে তা নিজের আয়ত্তে আনেন। কলকাতায় ফিরে এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলে, সেই মহীশূরী সুর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এস হে গৃহদেবতা', 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' প্রভৃতি বিখ্যাত গান রচনা করেন। দ্বিতীয়বার মহীশূরে 'মহারাণী গার্লস স্কুলে' অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট পদে চাকরিসূত্রে গিয়ে তিনি একজন ইতালিয়ান মাস্টারের কাছে বেহালা বাজানো শিখতে শুরু করেন এবং ইউরোপীয় বেহালা বাজানোর পদ্ধতির সাথে মহীশূরী বেহালা বাজানোর পদ্ধতির তুলনা করেন।

সরলা দেবী কেবল নিজের গানেই সুর দেননি, তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত কিছু গানেও সুরারোপ করেছিলেন। যার মধ্যে 'জননী ভারতভূমি', 'জননী আমার জন্মভূমি', 'এমনি করে তারো কি কাঁদে প্রাণ', 'সবিনব শ্রাবণ মাস' ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রথম বাঙালি সৈনিকদল গঠিত হয়ে যখন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাসরায় যুদ্ধ যাত্রার পথে লাহোর স্টেশনে সমাগত হয়, তাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে তিনি সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার জন্য 'কোন রূপসাগরে ডুব দিলি রে বাঙালী সেপাইরা' গানটি রচনা করেছিলেন, যা বাঙালি রেজিমেন্টের মার্চিং-এর উপযোগী গান হিসেবে তৈরি হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে তাঁর নিজের রচিত ও সুরারোপিত ৩০টি গানের সংকলন 'গীতিত্রিশতী' নামে প্রকাশিত হয়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সংগীতচর্চার ইতিহাস অত্যন্ত সুবিস্তৃত ও গৌরবময়। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে যখন নারীদের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত, তখন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে প্রবহমান ছিল এক ভিন্ন উদার ও প্রগতিশীল হাওয়া। সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এই পরিবারের নারীরা কেবল পুরুষদের সহযোগী ছিলেন না, বরং অনেকেই নিজস্ব প্রতিভায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলো ছড়িয়েছেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর ব্যক্তিত্বের উজ্জীবনে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি একাকী জাহাজে চড়ে বিলাতে স্বামীর কাছে পাড়ি দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক ও আধুনিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা সে যুগের এক পরম বিস্ময়কর ও চঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার, আধুনিকমনস্কতা এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এই প্রগতিশীল মানসিকতার ফলেই ঠাকুরবাড়িতে আধুনিকতার হাওয়া সগৌরবে প্রবাহিত হয়েছিল, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের ওপর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাদম্বরী দেবীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন এঁদের গভীর প্রভাব ছিল, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং কন্যা ইন্দিরা দেবী কবির অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র ছিলেন। বিশেষ করে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ ভালবাসতেন এবং কতখানি গভীর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে কবির বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে তাঁর কালজয়ী চিঠিপত্র সংকলন 'ছিন্নপত্র'-এ।

'ছিন্নপত্র'-এর চিঠিসমূহ রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, এক কিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে। দীর্ঘকাল ধরে চিঠির মাধ্যমে এই দুই অসমবয়সী অথচ সমমনস্ক মানুষের মধ্যে মনের ভাবের যে আদান-প্রদান চলেছিল, তা সাহিত্যিক মূল্যে অতুলনীয়। ইন্দিরা দেবী অত্যন্ত সযত্নে এই চিঠিপত্রগুলি রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বছর বয়স হয়, তখন ইন্দিরা দেবী নিজ হাতে এই চিঠিগুলির অনুলিপি তৈরি করে কবিকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এর পেছনে গভীর একটি কারণও ছিল। কবি কোনো এক সময়ে ইন্দিরাকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

> "যেসব চিঠি আমি তোকে দিয়েছিলাম সেগুলি আমার মাঝে মাঝে ফিরে পড়তে ইচ্ছা করে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে বহু মানুষকে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু এত গভীর আত্মিক কথা এবং এত বিপুল সংখ্যক চিঠি তিনি আর কাউকে লেখেননি। বিশ্বভারতী পরবর্তীতে 'ছিন্নপত্র'-এর উনিশটি খণ্ড প্রকাশ করেছে, তবে এই বিপুল চিঠিপত্রের মধ্যে যে বইটি সবচেয়ে বিশিষ্ট ও কালজয়ী স্থান অধিকার করে আছে, তা হল 'ছিন্নপত্র' (পরবর্তীকালে প্রকাশিত যার পূর্ণতর পাঠের নাম 'ছিন্নপত্রাবলী')।

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিগুলিকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত সামগ্রী হিসেবে রাখতে চাননি, বরং সর্বসাধারণের জন্য তা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে প্রকাশের সময় ব্যক্তিগত ও অতি-গোপন অংশ কিছু বাদ বা ছিন্ন করা হয়েছিল বলেই এর নাম হয়েছিল 'ছিন্নপত্র'। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

> "ছিন্ন হইবার রক্তের দাগ ইহাদের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে।"[৪]

তা সত্ত্বেও, পৃথিবীর ইতিহাসে কীটস বা রিলকের চিঠিপত্রের মতোই 'ছিন্নপত্র' এক অনন্য সাহিত্যিক মর্যাদার দাবিদার, যা ইন্দিরা দেবীর সযত্ন প্রয়াস ছাড়া হয়তো আলোর মুখ দেখত না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি শিক্ষা ও ভাষাচর্চার আবহ ছিল অত্যন্ত উন্নত। জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা হিসেবে ইন্দিরা দেবীও এই পরিমণ্ডলে অন্যতম অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করেছিলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন, যা তখনকার দিনে একজন 'বঙ্গললনা'-র পক্ষে ছিল একবিরাট ঐতিহাসিক সাফল্য। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

ঠাকুর পরিবারে সাহিত্যচর্চার সমান্তরালে ভাষা চর্চাও অব্যাহত ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ইন্দিরা দেবী অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিরিদ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলিতে মলিয়েরের যে ফরাসি প্রভাব ছিল, তা ইন্দিরাকে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই বহুভাষিক জ্ঞান ও উন্নত রুচিবোধের কারণেই পরবর্তীকালে প্রখ্যাত মননশীল সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। শৈশব ও কৈশোর থেকেই ইন্দিরা দেবী এক অসাধারণ উন্নত বোধ, গভীর রসবোধ ও মার্জিত রুচির অধিকারী ছিলেন।

ঠাকুরবাড়ি থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ইন্দিরা-জননী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। এছাড়া 'ভারতী' নামে ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব আরেকটি নামী পত্রিকা ছিল। ১৮৯২ সালের পৌষ মাসে 'বালক' পত্রিকায় জন রাস্কিনের একটি ইংরেজি রচনার বাংলায় অনুবাদ প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় বারো বছর বয়সী কিশোরী ইন্দিরা পুরস্কৃত না হলেও, তাঁর লেখা অনুবাদটি পত্রিকায় অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে ছাপা হয়। তখন সমাজলজ্জা ও পারিবারিক রীতির কারণে লেখিকার পুরো নাম ছাপা হত না, কেবল 'শ্রীমতী ইঃ' নামে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটিই ছিল ইন্দিরা দেবীর জীবনের প্রথম মুদ্রিত রচনা।

পরবর্তী জীবনে তিনি সমাজ, নারী ও সংগীত নিয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর সমাজভাবনামূলক রচনার মধ্যে ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'নারীর উক্তি' এবং 'বাংলার স্ত্রী-আচার' (১৩৬৩) গ্রন্থ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সে যুগের সমাজবাস্তবতা ও নারীর অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে তাঁর প্রধান অবদান নিহিত রয়েছে সংগীত বিষয়ক গবেষণায়। তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম' (১৯৫৪) এবং মৃত্যুর বছরে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৯৬০) গ্রন্থ দুটি রবীন্দ্রসংগীতের ধারা ও উৎস বুঝতে আজও অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের সার্থক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরাধিকারী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ১৮৯৪ সালের একটি পত্রে ইন্দিরাকে (যাঁকে তিনি ভালবেসে 'বব' বলে ডাকতেন) লিখেছিলেন—

> "আমিও জানি বব, তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্রভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে, এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই ইচ্ছে করলেও আমি তাদের এ সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার একথা কখনো মনে উদয় হয় না, যে তুই আমার কথা বুঝবি নে, কিংবা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস করবি নে। কিন্তু সেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা। সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সু-রচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেইজন্যে আমি যেমনটি ভাবি, ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। ... তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে, যে সত্য আপনিই তোর কাছে অতিসহজে প্রকাশিত হয়।"[৫]

কবির এই অগাধ বিশ্বাস ও ইন্দিরার সুরবোধের মেলবন্ধনে রবীন্দ্রসংগীত এক নতুন মাত্রা পায়। বস্তুত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে প্রাক-দিনেন্দ্রনাথ পর্বে ইন্দিরা দেবীর ভূমিকাই ছিল প্রধান ও সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রমে স্বরলিপি তৈরি করেন।

'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা', 'গীতবিতান বার্ষিকী', 'সুরঙ্গমা পত্রিকা', 'আনন্দসংগীত পত্রিকা', 'দক্ষিণী রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১), 'সুরছন্দা', 'সমকালীন' (পৌষ ১৩৬০) এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (কার্তিক ১৩৪৯)-সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর সংগীত ও স্বরলিপি বিষয়ক বহু বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বরলিপি নির্মাণ, বিভিন্ন সময়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 538 - 546
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রসংগীতের রূপান্তর এবং রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে তিনি যে সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক আলোচনা করে গেছেন, তা আজকের দিনেও যেকোনো সংগীত গবেষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ঠাকুরবাড়ির নারীকণ্ঠের সেই সুরের আলাপন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর হাত ধরেই স্বরলিপির অক্ষরে অক্ষরে চিরন্তন রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা সম্পর্কে বলেছেন—

> "আমাদের পরিবারে গান চর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। ... বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসরের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি, বেশ মনে পড়ে।"[৬]

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর কেবল চার দেয়ালের অবরুদ্ধ সীমানা ছিল না, বরং তা ছিল উনিশ শতকের সংকীর্ণ সামাজিক আবহে নারীসত্তার এক পলিফোনিক বা বহুমাত্রিক জাগরণক্ষেত্র। মহর্ষির দূরদর্শিতায় যে সুরের বীজ রোপিত হয়েছিল, তাকে সার্থক মহীরূহে পরিণত করেছিলেন স্বর্ণকুমারী, সরলা ও ইন্দিরা দেবীর মতো অনন্য ব্যক্তিত্বরা। তাঁরা সংগীতকে নিছক অন্দরের বিনোদন বা পুরুষতান্ত্রিক মনোরঞ্জনের বৃত্তে আটকে না রেখে— গীতিনাট্যের নতুন বিন্যাস, দেশাত্মবোধক গানের সুরারোপ এবং সঙ্গীতের তত্ত্ব ও স্বরলিপি সংরক্ষণের মাধ্যমে এক একটি স্বাধীন বৌদ্ধিক ও নান্দনিক স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায়, ঠাকুরবাড়ির নারীকণ্ঠের এই সুরের আলাপন আসলে কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা ছিল না; তা ছিল পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সুর, বাণী ও মননের যুগপৎ মেলবন্ধনে তৈরি এক শৈল্পিক প্রতিরোধ এবং বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে নারীর আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অমোঘ দলিল।

Reference:

১. দেব, চিত্রা, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৬
২. রীত, প্রত্যুষকুমার, (সংকলন ও সম্পাদনা), *ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, *ঠাকুরবাড়ির বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১২
৪. *রবীন্দ্রচর্চা: রবীন্দ্রভারতী কেন্দ্রের গবেষণা-পত্রিকা*, মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (প্রধান উপদেষ্টা), সংখ্যা ১১, সম্পাদক মৃন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯